

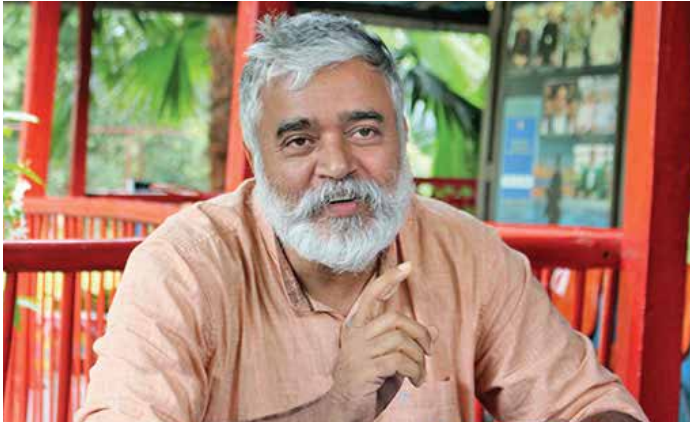


কোয়ান্টাম বুলেটিন

জুলাই ২০১৯

দক্ষিণ ভারতে কমিউনিটি বেইজড প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তক ডা. সুরেশ কুমার

সুস্থ জীবনাচারই পরিতৃপ্ত মৃত্যুর চাবিকাঠি



‘আমি যদি জীবনের সুস্থ-স্বাভাবিক দিনগুলোতে ভালো থাকার চর্চা না করি—সেটা দেহের হোক বা মনের—তাহলে কখনোই প্রত্যাশা করতে পারি না যে, আমার শেষ দিনগুলো সুখের হবে। এটাই বাস্তবতা। তাই আমার কথা হলো, Living well is the key to dying well. Meaningful and purposeful life is the key to peaceful death. কোয়ান্টামের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রমেও আমি দেখছি এই একই চিন্তার প্রতিফলন—ধর্মবর্ণানির্বিশেষে কোয়ান্টামও সব ধরনের মানুষকে সুস্থ সুন্দর অর্থময় ও লক্ষ্যপূর্ণ জীবনের দিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে তুলছে।’

কথাগুলো বলেন দক্ষিণ ভারতের কেরালায় কমিউনিটি বেইজড প্যালিয়েটিভ কেয়ারের প্রবর্তক এবং ইনস্টিটিউট অব প্যালিয়েটিভ মেডিসিন-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন পরিচালক ডা. সুরেশ কুমার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যালিয়েটিভ মেডিসিন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডা. নিজামউদ্দিন আহমেদের সাথে তিনি ১৪-১৬ জুন বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম সফর করেন। অনানুষ্ঠানিক এ সফরে তিনি

কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজ, চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র শাফিয়ান এবং ১৯ জুন ঢাকার শান্তিনগরে কোয়ান্টাম ল্যাব পরিদর্শন করেন।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ মৃত্যুবরণ করে আকস্মিকভাবে। বাকি ৮৫ ভাগ মানুষের শেষ বিদায়টি হয় স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি রোগ কিংবা বার্ষিকজনিত দুর্দশার তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। উপরন্তু নিরাময়-অযোগ্য রোগে আক্রান্ত কেউ যখন জানতে পারেন যে, মৃত্যু আসন্ন; তখন দৈহিক যন্ত্রণার পাশাপাশি মানসিক আত্মিক সামাজিক-সবদিক থেকেই তিনি মুখড়ে পড়েন। এই মানুষদের ভোগান্তি কমাতেই কাজ করে প্যালিয়েটিভ কেয়ার।

প্যালিয়েটিভ কেয়ারকে প্রচলিত ও প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসাব্যবস্থার বাইরে সামাজিক পর্যায়ে প্রথম বিস্তৃত করেন ডা. সুরেশ কুমার। ১৯৯৩ সাল থেকেই তিনি এ ব্যাপারে কেরালার সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন করে তুলতে থাকেন। এভাবেই ক্রমশ ওখানে প্যালিয়েটিভ কেয়ার হয়ে ওঠে সমাজভিত্তিক একটি কার্যক্রম। বর্তমানে এর রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল। এ কার্যক্রমের অর্থের জোগানও দেন এ

স্বেচ্ছাসেবকরাই। ডা. সুরেশ মনে করেন, দাতা সংস্থাগুলো থেকে যে অর্থ পাওয়া যায়, তার চেয়ে নিজেদের সাধ্যমতো দান বেশি কার্যকর।

প্যালিয়েটিভ কেয়ার ব্যবস্থায় সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তোলার এ ধারণাটি বর্তমানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত একটি মডেল। ভারতে রয়েছে এর ১৫০০টি শাখা, যার ১৩৫০টি খোদ কেরালাতেই। বাংলাদেশসহ থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কাতেও অনুসরণ করা হচ্ছে এই ‘কেরালা মডেল’।

কথাপ্রসঙ্গে ডা. সুরেশ বলেন, অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেন এই কাজের শুরুতে আমার মহৎ কোনো চিন্তা বা উদ্দেশ্য ছিল কিনা? আমি বলি, ঠিক তা নয়, আসলে এটা করতে আমার ভালো লাগে, তাই করি। আর এ প্রয়োজনীয় কাজটি তো কাউকে না কাউকে করতে হবে।

এ-ছাড়াও আমি বিশ্বাস করি, চিকিৎসকরা যখন রোগীর সেবা করেন বা কেউ যখন অন্য কোনো সেবামূলক কাজ করছেন তখন কিন্তু তিনি সেবাগ্রহীতাকে করুণা করছেন না; বরং নিজেই নিজেকে সাহায্য করছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ক্রমাগত শিখছেন এবং জীবন সম্পর্কে নতুন উপলব্ধি লাভ করছেন। নিজের উত্তরণ ঘটাচ্ছেন। তাই পরার্থে কাজ করতে হবে সদিচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে; অন্যকে করুণা করছি, তা ভেবে নয়।

আমি সবসময় চেষ্টা করি রোগীর কথা মন দিয়ে শুনতে। এ থেকে আমি অনেক কিছু শিখতে পারি, কারণ প্রতিটি মানুষেরই একটি করে গল্প আছে। অভিজ্ঞতায় দেখছি, কেউ কেউ তার জীবনীশক্তির জোরে সমস্ত ভোগান্তি ও প্রতিকূলতাকে জয় করতে পারেন। নিজের সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করেন। আবার উল্টোটাও দেখছি। আসলে কে কীভাবে জীবনকে দেখছেন, তার ওপরই নির্ভর করে ভালো থাকা।

ঢাকায় তিন মাস পর কোয়ান্টাম মেথড কোর্স

আগামী ২, ৩, ৪ ও ৫ আগস্ট (শুক্রবার-সোমবার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৬১ তম ব্যাচ। ভেন্যু : ঢাকার কাকরাইলস্থ আইডিবি মিলনায়তন। জীবনকে সুস্থতা প্রশান্তি সাফল্যের পথে এগিয়ে নেয়ার অভিযাত্রায় অংশ নিন আপনিও। সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর পদ্ধতিতে মেডিটেশন শেখার পাশাপাশি এ কোর্সে রয়েছে সর্বতোভাবে জীবনকে সুন্দর ও অর্থবহ করে তোলার বিজ্ঞানসম্মত পথনির্দেশনা।

উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে ঢাকায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের পূর্ববর্তী ব্যাচটি।

দীর্ঘ ২৭ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, কোয়ান্টাম মেথড হলো সাফল্যের সরলপথ। একজন মানুষকে যা সাহায্য করে জীবন সম্পর্কে সঠিক ও আলোকিত দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে, উদ্বুদ্ধ করে তার ভেতরের ইতিবাচকতা বিকাশে, অনুপ্রাণিত করে আত্মশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণে।

এ কোর্সের শিক্ষা একজন মানুষকে মুক্তি দিতে পারে এ-কালের অভিলাষি ভার্চুয়াল ভাইরাসের আসক্তি থেকে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব, অনলাইন গেম, ভিডিও গেম, ইন্টারনেট ও স্মার্টফোন আসক্তিসহ যাবতীয় ভার্চুয়াল ভাইরাসকে প্রতিহত করতে প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করবে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স।

সেইসাথে কোর্সের অর্জন ও ইতিবাচক পরিবর্তনকে স্থায়ী রূপ দিতে রয়েছে কোর্স রিজুভিনেশনে অংশ নেয়ার সুযোগ। বছরে অন্তত দু-তিন বার সপরিবারে কোর্স রিজুভিনেশনে অংশগ্রহণ আপনার পরিবারকে করে তুলবে পারস্পরিক সমমর্মিতা ও অনুপ্রেরণার অফুরান উৎস।

প্রায় তিন দশকের পথ পরিক্রমায় মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে যেমন উপকৃত হচ্ছেন দেশের লক্ষ মানুষ, তেমনি এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে পরিবারে, সমাজে ও জাতীয় জীবনে। তাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে নিজে অংশ নিন। উদ্বুদ্ধ করুন আপনার আত্মীয়-বন্ধু-পরিচিত-স্বজনদের।

সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন

ড. মো. সাহাদ চৌধুরী। প্রাক্তন কন্ট্রোলার জেনারেল অব একাউন্টস ও বিশিষ্ট লেখক। লেখালেখির জগতে তিনি বিস্তৃত চৌধুরী নামে সুপরিচিত। তার রচিত 'স্বর্ণশিখর' বাংলা আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য ও বহুল প্রসংসিত গ্রন্থ। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ৪৭ ব্যাচে অংশ নেন। ১৭ জুন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় 'নিবিস্ট চাওয়া' বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি তার সেই আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

গুণীজনরা বলেন, বড় কিছু পেতে হলে স্বপ্ন দেখতে হবে। স্বপ্ন মানে কী? স্বপ্ন মানে আসলে ছক কাটা। কারণ আমাকে জানতে হবে—আমি কী চাই। আমার লক্ষ্য, স্বপ্ন, ছক যত স্পষ্ট হবে আমার অর্জনও হবে স্বাভাবিকভাবে তত বেশি। আত্ম উন্নয়নের মূল কথা এটাই।

এ কথাগুলো সেই তরুণ বয়সেই আমি জেনেছি কাজীদা—এদেশে আত্ম উন্নয়নমূলক সাহিত্যের পুরোধা কাজী আনোয়ার হোসেন এবং গুরুজী মহাজাতকের কাছে। তারা দুজন ছিলেন প্রফেসর এম ইউ আহমেদের শিষ্য। পরবর্তীতে আত্ম উন্নয়ন বিষয়ে আমার লেখালেখির অনুপ্রেরণাও গুরুজী। তিনি একবার বলেছিলেন, 'লেখার ক্ষমতা পেয়েও না লিখলে আপনাকে স্রষ্টার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ এ ক্ষমতা তাঁর দেয়া।'

আমার জীবনে প্রথম আত্ম উন্নয়নমূলক বইটির সন্ধান আমি পাই ১৯৬৮ সালে, বড় ভাইয়ের বইয়ের আলমারিতে। নেপোলিয়ান হিলের লেখা 'ল'জ অব সাকসেস ইন সিক্রেটস ওয়েজ। বইটির মোট ১৬টি অধ্যায়, প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই লেখা—You can, if you believe you can. তুমি পারবে যদি তুমি বিশ্বাস করো যে, তুমি পারবে। কথাটা আমাকে খুব আলোড়িত করেছিল সে-সময়।

নেপোলিয়ান হিল এ বইটিতে কিছু সাফল্যকৌশল বাতলে দিয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি ছিল—'আপনি যা চান তা একটি কাগজে সুস্পষ্টভাবে লিখুন। ওটা পকেটে বা মানিব্যাগে রাখুন। মাঝে মাঝে দেখুন। জোরে জোরে পড়ুন।'

তখন আমার কৈশোরোত্তীর্ণ বয়স, আমি দেখলাম এর মধ্যে একটা সাসপেন্স আছে। আমিও লিখে ফেললাম আমার একটা লক্ষ্য।

ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু ম্যাট্রিকের ফল সে অনুযায়ী অতটা ভালো হয় নি। মনটা স্বাভাবিকই খারাপ। আর বইটা যখন হাতে পাই তখন আমি উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের ছাত্র। ঢাকা কলেজে পড়ি। তো আমিও আমার লক্ষ্য ঠিক করে কাগজে লিখে ফেললাম—'উচ্চ মাধ্যমিকে আমি বোর্ডে প্রথম হবো।'

লিখলাম বটে, কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকি—কে কখন দেখে ফেলে! হাসির পাড় হবো তাহলে। মাঝে মাঝে কাগজটা খুলে দেখি। এর মধ্যে ফার্স্ট ইয়ার ফাইনাল পরীক্ষা হলো। আমি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হলাম। কোথায় বোর্ডে প্রথম আর কোথায় দ্বিতীয় বিভাগ! ভাললাম, কিছুই তো হলো না—কাগজটা ফেলে দিই। আবার ভাললাম, দেখি না কী হয়, একটা স্মৃতি হিসেবেই না-হয় থাকুক কাগজটা।

যা হোক, একসময় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় হয়ে এলো। পরীক্ষা দিলাম। ফল প্রকাশের দিন আমার মেজো ভাই ড. নঈম চৌধুরী, যিনি বর্তমানে এটমিক এনার্জি রিগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যান, খবরের কাগজ পড়ে হস্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বললেন, তোমার না রেজাল্ট বেরিয়েছে, দেখেছ? আমি কিছুটা ঢিলেঢালা ভঙ্গিতেই বললাম, দেখব, এত তাড়াছড়ো করার কী আছে? তিনি বললেন, তুমি রেজাল্ট দেখো নি এখনো? তুমি বোর্ডে চতুর্থ হয়েছ!

আমি হতবাক। এ-ও কি সম্ভব? পরে বুঝেছি, এসব পরীক্ষার ফলাফলে প্রথম আর চতুর্থ স্থানধারীর নম্বরের পার্থক্যটা থাকে খুব সামান্যই এবং ফার্স্ট ইয়ার ফাইনালের রেজাল্ট বের হওয়ার পর নিজের লক্ষ্য অর্থাৎ কাগজের লেখাটা নিয়ে ঐ দ্বিধাটুকু যদি না থাকত, তবে আমি বোর্ডে ঠিক প্রথমই হতাম।

সত্যিকার চাওয়াটা আসলে এমনই। চাওয়া যদি নিখুঁত হয়, আন্তরিক হয়, এর জন্যে কর্মপরিকল্পনা যদি সঠিক হয় তবে লক্ষ্যে আপনি পৌঁছবেনই। কে যেন আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে। কিংবদন্তি বক্সার মোহাম্মদ আলীর কথাই ধরুন। তিনি

শুদ্ধ চাওয়াকে স্রষ্টাই পূর্ণতা দেন

ড. মো. সাহাদ চৌধুরী



যখন নিজের ব্যাপারে বলতেন যে, তিনি একজন বিশ্বসেরা মুষ্টিযোদ্ধা, তখনো তার তেমন কোনো পরিচিতিই ছিল না। একসময় তার অবচেতন মনই ক্রমান্বয়ে তাকে নিয়ে গেছে তার কাক্ষিত অবস্থানে।

এটাই হয় আসলে। তাই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কোনোই বিকল্প নেই। মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের একটা কথা আছে—'তুমি যদি উড়তে না পারো তবে দৌড়াও, দৌড়াতে না পারলে হাঁটো, তা-ও না পারলে হামাগুড়ি দাও। যা-ই করো, এগিয়ে তোমাকে যেতে হবেই।'

এ পি জে আব্দুল কালাম তার আত্মজীবনীতে থিরুঙ্কুরাল নামে একটি বইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। দুহাজার বছর আগে তামিল সাধক থিরুভাল্লুভার রচিত এ বইটি মূলত সহস্রাব্দিক ছোট ছোট নীতিকথা ও হিতোপদেশের একটি সংকলন। তাতে একটি কথা আছে—তুমি আকাঙ্ক্ষা করো। তোমার আকাঙ্ক্ষাই তোমাকে পৌঁছে দেবে তোমার লক্ষ্যে।

আকাঙ্ক্ষা বা চাওয়া নিবিস্ট হলে, তাতে শতভাগ আন্তরিকতা থাকলে পরম করুণাময় কীভাবে তা পূরণ করেন, তার আরেকটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নিজের জীবন থেকেই দিতে পারি।

সেবার রোমে গেছি। ভিসুভিয়াস দেখতে যাব। শৈশব থেকে এত পড়েছি ও শুনেছি ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির কথা। নির্ধারিত দিনে ভিসুভিয়াস পাহাড়ের নিচে সমবেত হলাম আমরা তিন সহকর্মী। চূড়া পর্যন্ত মোট উচ্চতা ১২৮০ মিটার, এর মধ্যে ৬০০ মিটার পর্যন্ত গাড়িতে ওঠা যায়। বাকিটা উঠতে হবে হেঁটে।

দিনটা ছিল বৃষ্টি আচ্ছন্ন, মেঘলা। সহকর্মী দুজন বয়সে তরুণ, ওরা তরতর করে উঠে যাচ্ছিল। আমি ধীরে ধীরে উঠছি। বার বার পিছিয়ে পড়ছি। আমার কষ্ট বুঝতে পেরে ওরা বলল, স্যার, আপনি না-হয় এখানেই থাকুন। বিশ্রাম নিন। আমরা চূড়াটা ছুঁয়েই খুব তাড়াতাড়ি চলে আসব। আমি বললাম, শোনো, আমার একটি লক্ষ্য আছে। আমি ভিসুভিয়াসের চূড়ায় উঠব এবং সোচ্চারে ঘোষণা করব—সমস্ত প্রশংসা তাঁর!

ওরা আর কিছু বলল না। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পর অবস্থা এমন হলো যে, আমার সারা শরীরে ব্যথা। আমার হাটও তখন ছিল বেশ দুর্বল। সবমিলিয়ে আর নড়তেই পারছিলাম না। মনে হচ্ছিল একটা বাঁশের লাঠি যদি কোনোক্রমে পেতাম এখন, তাতে অন্তত ভর দিয়ে ওঠা যেত। কিন্তু তা কি হয়? এখানে কোথায় পাব তেমন লাঠি?

একটু জিরিয়ে নেয়ার ফাঁকে বসে বসে এসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি সহকর্মীদের একজন ওপর থেকে ছুটে ছুটে আসছে, তার হাতে আমার বুক-সমান একটা বাঁশের লাঠি! কাছে এসে সে বিনয়ের সাথে বলল, স্যার, এটা কি আপনি ব্যবহার করবেন? পাহাড়ে উঠতে কিছুটা সুবিধে হবে।

আমি বিস্মিত! এমনটাও ঘটে? অতঃপর সেই পড়ন্ত বেলায় মেঘে ভিজতে ভিজতে লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে আমি ভিসুভিয়াসের চূড়ায় পৌঁছলাম। বিস্ময়াভিভূত হয়ে দেখলাম চারপাশ। ভাবছিলাম এ কী করণা তাঁর! আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে বললাম, প্রভু, সমস্ত প্রশংসা তোমার। এ অবস্থানে এ উচ্চতায় আমাকে আসার সুযোগ ও সামর্থ্য দেয়ার জন্যে তুমি আমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করো।

আসলে কাতর হৃদয়ে মানুষের একান্ত চাওয়াতে স্রষ্টা এভাবেই সাড়া দেন। এজন্যে আমাদের প্রত্যেককেই একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। পড়তে হবে, জানতে হবে এবং পরম করুণাময়ের কাছে সমর্পিত হতে হবে। মানুষের যে-কোনো শুদ্ধ চাওয়াকে পূর্ণতা তিনি দেনই।

অভিজাত রেস্টোরাঁর খাবার বর্জন করুন খাদ্য সন্ত্রাসের কবল থেকে বাঁচুন

গ্রামটির নাম ছিল সুখী গাঁ। কিন্তু এখন ওটাই হয়েছে দুখী গাঁ। কেন? চলুন শোনা যাক কী বৃত্তান্ত— ছোট্ট গ্রামের পরিব্রাজী মানুষগুলো সুখেই ছিল। শাকসবজি, ফলমূল আর বাড়ির রান্না করা খাবার খেয়ে সুস্থ জীবনযাপন করত তারা। তিন দশক আগে দুই বিদেশি বন্ধু এলো সেখানে। প্রথমজন শুরু করল খাবারের ব্যবসা। গ্রামের মানুষকে বোঝাল সে— জাতে উঠতে হবে, তাই খেতে হবে ভিনদেশি প্রক্রিয়াজাত খাবার। গ্রামের মানুষকে জাতে (!) তোলার মোহে মতিয়ে তুলল সে। কোমল পানীয়, এনার্জি ড্রিংকস, ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্ট ...। গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় তার দোকান হলো। এরই মাঝে দ্বিতীয় বিদেশি গড়ে তুলল ঝকঝকে ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টার।

কোমল পানীয় আর প্রসেসড ফুড খেয়ে মানুষ আক্রান্ত হতে লাগল কিডনি জটিলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগসহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে। অসুস্থ হয়ে আর যাবেই বা কোথায়? ডায়াগনস্টিক সেন্টার আর ক্লিনিকের পেছনে দেনারসে খরচ হতে লাগল তাদের অর্থসম্পদ। এখন সে গ্রামে প্রতি সাত জনে একজন কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত এবং প্রতি ১৬ জনে একজন ভুগছে ডায়াবেটিসে। বিদেশি বণিকদ্বয় তো বেজায় খুশি। কারণ গ্রামের প্রতিটি মানুষের আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ (খাবার ও চিকিৎসাব্যয় বাবদ) প্রতি মাসে ঢোকে তাদের পকেটে। তাদের মুখের হাসি দিনে দিনে চওড়া হচ্ছে বটে। কিন্তু গ্রামের অবস্থা দেখে আশপাশের গ্রামের মানুষ এ গ্রামের নাম রেখেছে দুখী গাঁ।

পাঠক, এই রূপক গল্পের সাথে যদি বাস্তবের কোনো মিল খুঁজে পান, তাহলে সেটা কোকিলতাল মাত্র! তবে সময়ের সাথে সাথে আমাদের ব্যস্ত জীবনে ঢুকে পড়েছে অনেক আধুনিক (!) অভ্যাস। তার একটি হলো নিত্যনতুন রেস্টোরাঁয় খাওয়া। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উসকানি আর মিডিয়ার অপ্রচারের বন্ধুরা মিলে রেস্টোরাঁয় খেতে যাওয়া আর সেলফি তুলে ফেসবুকে পোস্ট দেয়া এখন হালের ট্রেন্ড!

এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে খাবারের অর্ডার দেয়ার ফুটানি। কর্মজীবী মহিলাদের সংখ্যা বাড়ছে, তাই কর্মব্যস্ত দিনশেষে বাসায় রান্নার ঝামেলা এড়াতে সহজ পন্থা—অনলাইনে খাবার অর্ডার। এ-ছাড়া বিশেষ দিবস ও বিভিন্ন উপলক্ষে এখন সপরিবারে বাইরে খেতে যাওয়া পরিণত হয়েছে ফ্যাশনে। এভাবেই আমরা প্রশ্রয় দিচ্ছি ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, কিডনি সমস্যাসহ দীর্ঘমেয়াদি রোগব্যাধিকে। নামী রেস্টোরাঁর আকর্ষণীয় মোড়ক লাগানো দামি এ খাবারগুলো খেয়ে কীভাবে শরীরের বারোটা বাজছে আসুন দেখি—

বেকারি আর ফাস্টফুড ৯ খাদ্য সন্ত্রাসের নতুন রূপ

একটা সময়ে স্বনামখ্যাত বেকারিগুলোর প্যাকেট দেখে বিস্কুট, পাউরুটি, চানাচুর, বাটার বান, পেটিস, কেক নিশ্চিন্তে কিনত মানুষ। কারণ দিনের বানানো খাবার দিনেই বিক্রি করত তারা। কিন্তু এখন সে যুগ হয়েছে বাসি, নীতির গলায় লোভ দিয়েছে ফাঁসি!

কোনো বেকারির খাবারই এখন আর নিরাপদ নয়। কারণ মুনাফার লোভে অসাধু ব্যবসায়ীরা মোড়কে উৎপাদনের প্রকৃত দিন-তারিখ লাগান না। লাগান তা-ই, যা দেখলে ক্রেতা প্রতারণিত হয়ে নষ্ট খাবার কিনবেন। ফলে বাড়ছে মুনাফা, বাড়ছে ক্লিনিক আর ডায়াগনস্টিক সেন্টারের পসার।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়, সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রতিবেদন আর সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের পরিচালিত ভেজাল বিরোধী অভিযানে বেরিয়ে এসেছে থলির বেড়াল। উৎপাদন খরচ কমিয়ে অধিক মুনাফা করতে রংচঙা ফাস্টফুডের দোকান আর বেকারিগুলোতে চলছে রীতিমতো গোটা জাতিকে ভয়ঙ্কর করার ষড়যন্ত্র! কীভাবে?

- শৌচাগারের পাশে অপরিস্ফুট পরিবেশে খাবার তৈরি করে কর্মীরা। তাদের নিজেদের পরিচ্ছন্নতার কোনো বালাই নেই। সরাসরি ওয়াসার বা ময়লা পানি ব্যবহার করা হয় খাবার তৈরিতে।
- জন্মদিনের কেক আর আইসক্রিমের ক্রিম বানাতে ব্যবহার করা হয় ক্ষতিকর চর্বি, কেমিক্যাল ফ্লেভার, পামঅয়েল ও কাপড়ের রং। যে রং কাপড়ে লাগালে বছরের পর বছর ধুলেও মলিন হয় না, সেই রং! কারণ ফুড গ্রেড কালারের দাম কাপড়ের রংয়ের চেয়ে আট/দশগুণ বেশি।
- চানাচুর মচমচে করতে পোড়া পামঅয়েলে ভাজা হয়। খরচ বাঁচাতে মিষ্টিতে চিনির বদলে মেশানো হয় নিষিদ্ধ স্যাকারিন এবং ঘন চিনি বা সোডিয়াম সাইক্লামেট। টমেটোর সস তৈরি হয় কিছু রাসায়নিক উপাদান আর কাপড়ে দেয়া রং মিশিয়ে, যেখানে থাকে না টমেটোর 'ট'-ও।
- রান্নার জন্যে বাতিল তেল কম দামে কিনে আনা হয়। সস্তা, মেয়াদোত্তীর্ণ, পোড়া তেল ব্যবহৃত হয় খাবার বানাতে। একই তেল বার বার ব্যবহার করা হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক। মেয়াদোত্তীর্ণ রুটি দিয়ে বানানো হয় বার্গার, স্যান্ডউইচ, পিজ্জা।
- বাসি, পচা, ফাংগাস পড়া মাংস দিয়ে কিমা বানিয়ে ক্রেতাদের ধোঁকা দেয়া হয়। মরা মুরগি দামে সস্তা বলে তাদের প্রথম পছন্দ ওটাই!
- খাবার সুস্বাদু করার জন্যে ব্যবহার করা হয় নিষিদ্ধ কেমিক্যাল। কেমিক্যাল মিশিয়ে পচা ফলের জুস বিক্রি হয়।



- সর্বতোভাবে বাইরের খাবার বর্জন করুন। ফাস্টফুড পুরোপুরি পরিহার করুন। অফিসের লাঞ্চে, পিকনিক কিংবা বেড়ানোর সময় বাসা থেকে খাবার রান্না করে নিয়ে যান।
- বিশেষ সাফল্য, বিবাহ বার্ষিকী, সন্তানের জন্মদিন ইত্যাদি উপলক্ষে মিষ্টির বদলে খেজুর বা দেশীয় ফল দিয়ে অন্যদের আপ্যায়ন করুন।
- বাচ্চাদের টিফিনে বাড়ির রান্না করা খাবার রাখুন। কর্মজীবীরা ফল বা বাসায় বানানো খাবার সাথে রাখুন। প্যাকেটজাত কেক বা বান বর্জন করুন।

ঘন চিনি বা সোডিয়াম সাইক্লামেট। স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণে সারা পৃথিবীতেই এটি নিষিদ্ধ। এর সাথে বিষাক্ত সার ম্যাগনেসিয়াম সালফেট মিশিয়ে তৈরি করা হয় বিকল্প চিনি, যা সাধারণ চিনির চেয়ে ৫০ গুণ বেশি ক্ষতিকর। খরচ বাঁচাতে এই ভয়ংকর বস্তুটিই ব্যবহৃত হচ্ছে মিষ্টি ও মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য, চকোলেট, আইসক্রিম, কনডেন্সড মিল্ক, বেকারি ও বোভারেজ দ্রব্য তৈরিতে। এসব খেয়ে দেশে আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে ক্যান্সার, কিডনি সমস্যা, ডায়াবেটিস, হৃদরোগসহ জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।



মিষ্টি ৯ কী অনাসৃষ্টি!

বিয়ে অথবা জন্মদিন, পরীক্ষায় সাফল্য কিংবা চাকরি-আত্মীয়-বন্ধুদের মিষ্টিমুখ করানো বহু পুরনো রেওয়াজ। আর এই সুযোগের অসম্ভবহারে পটু হয়ে উঠেছে সংশ্লিষ্টরা। খুব পরিচ্ছন্ন পরিবেশে সাজিয়ে রাখা হলেও সরকারের ভেজাল বিরোধী অভিযানে বেরিয়ে এসেছে—

- উৎপাদনের একদিন পরের তারিখ বসানো হয় মিষ্টি ও দইয়ের প্যাকেটের গায়ে। মিষ্টি বানানো হয় দুধ ছাড়াই! চিনির বদলে স্যাকারিন আর ঘন চিনি ব্যবহার করা হয়। মেশানো হয় টিস্যু পেপার, ক্ষতিকারক রং ও কেমিক্যাল।
- কারখানায় মিষ্টি তৈরির পর রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মাছি ও পোকা পড়ে থাকে মিষ্টিতে। রান্না ও সংরক্ষণের পাত্র পরিষ্কার করা হয় কদাচিৎ।
- এসব খাদ্য সন্ত্রাসীদের জারিজুরি ফাঁস ও সরকার কর্তৃক জরিমানার কথা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে সরবে প্রচার হচ্ছে। তাই আশু সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। বাইরের খাবার ছেড়ে ফিরতে হবে বাড়িতে তৈরি খাবারে। ছাড়তে হবে রেস্টোরাঁর খাবার অর্ডার করার অভ্যাস। কমবে স্বাস্থ্যঝুঁকি, অসাধু ব্যবসায়ীদের কবল থেকে বাঁচবে জাতীয় স্বাস্থ্য।
- প্রিয় পাঠক, এ নিবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত দৃশ্যপট কাল্পনিক হলেও আশঙ্কাগুলো একেবারে অমূলক নয়। আমাদের এই সুখী মানুষের দেশ যাতে স্বাস্থ্যহীন দুখী দেশে পরিণত না হয়, সে দায়িত্ব আমাদের সবার। তাই নিজে বাঁচুন। বাঁচান আপনার পরিবারকে।

গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

এত দেরিতে কেন এলাম?

জগদীশ দেবনাথ



আমি শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রে দীক্ষিত এবং ১৯৭৩ সাল থেকে ধ্যানচর্চা করি। কোয়ান্টামে আসার জন্যে দীর্ঘদিন ধরেই আমার গুরুদ্বাতা হৃদয়রঞ্জন বিনী আমাকে অনুপ্রাণিত করছিলেন। আমি তাকে সবসময়

বলতাম, আমি তো ধ্যানচর্চা করছি। কোয়ান্টামে গিয়ে নতুন করে কী শেখার আছে!

অবশেষে আমার মেয়ে বলল, চলো কোয়ান্টামে যাই। এত মানুষ যখন যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই ভালো কিছু আছে। আমার মেয়ে একজন ডাক্তার এবং সে নিজেও মেডিটেশনে অংশ নিয়েছে।

এখানে এসে চার দিন পর মনে হচ্ছে, এ এক অভূতপূর্ব অনুভূতি! আমি ২০০৩ সাল থেকে সেগুনবাগিচায় থাকি, যা কোয়ান্টামের কার্যালয় থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের হাঁটপথ। অথচ আমি এ কোর্সে এত দেরিতে কেন এলাম?

প্রতিটি মানুষেরই এই কোর্সে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। তাহলে ধ্যানচর্চার মাধ্যমে শুধু নিজের নয়, চারপাশের সবকিছুর শুভকেন্দ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধ্যানের প্রায়োগিক রূপকে গুরুজী জনমানুষের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। আরেকটি বিষয় আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করেছে, তা হলো কোর্সে মায়ের বিপুল সংখ্যক উপস্থিতি। কারণ প্রতিটি পরিবারে তাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

[অবসরপ্রাপ্ত আই.আর.ও. নিবন্ধন পরিদপ্তর, ঢাকা। ৪৫২ ব্যাচ]

আমি নতুন জীবন পেয়েছি

সুরাইয়া আফরোজ সুপ্তি



২০১৭ সালে আমার মেরুদণ্ডের হাড় টিউমার ধরা পড়ে এবং পরবর্তীতে ক্যান্সারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তারপর আমাকে ২৮টি কেমোথেরাপি দেয়া হয়েছে। তখনো আমি জানতাম না যে, আমার কী হয়েছে।

যখন আমি জানতে পারলাম, সংসার স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে নানান চিন্তা আমার মনে বাসা বাঁধতে শুরু করল। আমার মন বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল। আমি শরীরে কোনো শক্তি পেতাম না, কোনো কাজে মনোযোগ দিতে পারছিলাম না। ক্ষুধা লাগত না, ঘুমের ওষুধ খেয়েও ঘুম হতো না। শুধু মনে হতো, আমি মারা যাব।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ! কোর্সের প্রথমদিন বাসায় ফিরে সংসারের কাজগুলো ক্রান্তি ছাড়াই নিজে নিজে করেছি। দ্বিতীয় দিন থেকে আমি স্বাভাবিকভাবে খাবার খেতে পারছি। সেদিন ঘুমের ওষুধ ছাড়াই খুব ভালো ঘুম হয়েছে আমার। কোয়ান্টামে এসে মনে হয়েছে—আমি নতুন জীবন পেয়েছি।

[গৃহিণী। ৪৫৮ ব্যাচ]

তরুণদের মূল্যবোধ জাগ্রত
করছে কোয়ান্টাম

অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ



এবছর এপ্রিল মাসে বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন এ ক ১ ৫ ৬ ম ১ ৫ (আরডিএ) দুই দিনের কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অ্যালামনাই হিসেবে আমি এতে অংশ নিই

এবং কোয়ান্টাম সম্পর্কে জানতে পারি। এরপর ঢাকায় আলোকায়ন কার্যক্রমে এসে সিদ্ধান্ত নিই, কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি আমি করব।

২২ বছর ধরে আমার ব্যাকপেইন। সবসময় কোমরে বেল্ট পরতে হতো। কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি আর কোনো ব্যথা অনুভব করছি না। এখন আমাকে আর বেল্ট পরতে হচ্ছে না। আমি মনে করি, যিনি যত নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করবেন, তিনি তত বেশি উপকৃত হবেন, সফল হবেন।

আমার উপলব্ধি হলো, পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে সত্যিকার অর্থে বড় করে না। তরুণদের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে তাদের সামনে একটি রোল মডেল প্রয়োজন। আর এই রোল মডেল হলো কোয়ান্টাম।

[একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৫৮ ব্যাচ]

২০ বছর পর কাঁদতে পেরেছি

রাবেয়া সুলতানা



গত বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে আমি প্যারালাইজড হয়ে যাই। অনেক চিকিৎসার পরও শারীরিকভাবে সুস্থবোধ করতাম না। একপর্যায়ে স্বামীর উৎসাহে মেডিটেশন চর্চা শুরু করি এবং লক্ষ করি, আমার শরীর

শিথিল হয়ে আসছে। অসুস্থতার জন্যে যে বিরক্তিবোধ কাজ করত, মেডিটেশন করে তা আর হচ্ছে না।

আগে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারতাম না। নিচু হয়ে কোনো জিনিস তুলতে পারতাম না। বেল্ট ছাড়া একমুহূর্ত চলতে পারতাম না। কিন্তু কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমি বেল্ট ছাড়াই হাঁটাচলা করতে পারছি। রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে পারছি। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

আমি আট বছর বয়সে আমার পিতৃসম চাচাকে হারাই। তখন থেকে আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। চাপা দুঃখগুলো কখনো প্রকাশ করতে পারতাম না। কোর্সে এসে ২০ বছর পর আমি কাঁদতে পেরেছি। আমার মনে হয়েছে, কান্নার সাথে সমস্ত রোগ-বলাই ধুয়ে মুছে যাচ্ছে।

[গৃহিণী। ৪৫৮ ব্যাচ]

কোর্সে এসে আমি প্রশান্তি
খুঁজে পেয়েছি

আফরোজা জামিল কঙ্কা



চার বছর ধরে কোয়ান্টামের সাথে আমার পরিচয়। সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে আমি নিয়মিত দান করি। সেই সূত্রেই আমি কোর্সে এসেছি। কোর্সের প্রতিটি আলোচনা এত চমৎকার

ও বিজ্ঞানসম্মত যে, সহজেই মনে গেঁথে যায়।

কোর্সে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তিটি এসেছে পারিবারিক মেডিটেশন থেকে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আমার বাবা (কর্নেল জামিল বীর উত্তম) শহিদ হন। আমার বয়স তখন ১২ বছর। জীবনের এতগুলো বছর পার করেও আমি সে বেদনা কখনো প্রকাশ করতে পারি নি।

পরবর্তীতে আমার মা মারা যান ২০১২ সালে। পারিবারিক মেডিটেশনে আমার মা-বাবা দুজনকেই খুব কাছ থেকে আমি অনুভব করেছি। অনেক প্রশান্তি পেয়েছি। ছোটবেলায় বাবাকে হারানোর জন্যে আমার ভেতর যে ব্যথা ছিল, ক্ষোভ ছিল, সেটা মন থেকে চলে গেছে। আমি খুব হালকা বোধ করছি।

[চিকিৎসালী। ৪৫৮ ব্যাচ]

মমতা দিয়ে মায়ের হাতটা
ধরতে চাই

আমিনুল মুরসালিন



মেডিকেল কলেজে আমি একজন সোশ্যাল মিডিয়া সেলিব্রিটি। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে কে কमेंট করছে, কয়টা লাইক এলো, কে কী ইমোজি রি-এস্ট করল, এগুলোর পেছনে প্রতিদিন ৭-৮ ঘণ্টা সময় আমার নষ্ট হতো।

ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার পথে আমি পোস্ট দিতাম—প্রাণের বাড়িতে যাচ্ছি। অথচ বাড়ি গিয়ে পরিবারকে সময় দিতাম না। মনে হতো ফেসবুকই শান্তির জায়গা। ইউটিউবে প্রচুর সময় ব্যয় করতাম।

কোর্সে গুরুজীর আলোচনা শুনে আমার উপলব্ধি হলো, জীবনের অনেক মূল্যবান সময় ইউটিউবের জন্যে আমি হারিয়েছি। পারিবারিক মেডিটেশনে মনে হয়েছে, আমাকে যিনি জন্ম দিয়েছেন সেই মাকে আমি কতই না কষ্ট দিয়েছি, দুর্ব্যবহার করেছি। খুব অনুশোচনা হচ্ছিল। তাই এবার বাড়ি ফিরে আমি মমতা দিয়ে মায়ের হাতটা ধরতে চাই।

[শিক্ষার্থী, বিডিএস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ, ঢাকা। ৪৫৮ ব্যাচ]

নিজের সম্ভাবনা বিকশিত করার পথনির্দেশ পেয়েছি

খন্দকার মো. মঞ্জুরুল আলম

বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে আমাদের সন্তানরা। একসময় সমাজের একটা দৃঢ় কাঠামো ছিল, যা এখন অনেকাংশেই ভেঙে পড়েছে। অনেকগুলো ভাই-বোন মিলে পরিবারের ভেতরে একটা সম্মিলিত ছিল। সেই একানুবর্তী পরিবার ভেঙে গড়ে উঠেছে ছোট পরিবার।



পরিবারই আমাদের মূল্যবোধের জায়গাটা তৈরি করেছে, শিখিয়েছে পারস্পরিক যোগাযোগ, বোঝাপড়া ও আদান-প্রদান। বর্তমানে এই ঘাটতিগুলো শিশুর বিকাশকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। কর্মজীবী মা-বাবারা বাধ্য হয়েই শিশুর হাতে তুলে দিচ্ছেন ডিজিটাল ডিভাইস। যন্ত্রের ভেতরে শিশুর আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছে।

এই শিশুদের রক্ষা করা আমাদের সবার কর্তব্য। আমরা যদি শিশুকে কোয়ান্টামের শিক্ষাগুলো দিতে পারি, তাহলে সে মানুষের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে। সম্পর্ক উন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে উঠবে বৃহত্তর সম্মিলিত এবং আমরা এগিয়ে যাব বড় সাফল্যের দিকে।

কর্মজীবন, পরিবারের ব্যস্ততা, নানাবিধ নিরাপত্তাহীনতা-সবমিলিয়ে এখন সবচেয়ে দুঃস্থাপ্য হলো প্রশান্তি। সমাজে যে যেখানে আছে, যা-কিছু সে পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, কোনোভাবেই সে প্রশান্ত হতে পারছে না। গুরুজীর আলোচনায় উপলব্ধি করলাম, প্রায় সবাই ভোগবাদিতার প্রতিযোগিতায় দৌড়াচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষের মনোদৈহিক নানা জটিলতা এবং এর বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বহুমুখী। কোয়ান্টামে এসে আমি নিজের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার এবং সফল হওয়ার পথনির্দেশ পেয়েছি।

[প্রাথমিক শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। ৪৫৭ ব্যাচ]

আমি বাঁচার স্বপ্ন দেখছি

দুর্গা দাস



সম্প্রতি আমার শরীরে একটি টিউমার ধরা পড়ে। অপারেশনের পর বায়োপসি করে ডাক্তার জানান যে, আমার ক্যান্সার হয়েছে। আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলাম। প্রথম কেমোথেরাপি নেয়ার পর শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা ছিল। মনে হতো, একমাত্র মৃত্যুই এই যন্ত্রণা থেকে আমাকে মুক্তি দেবে।

পরবর্তীতে একজন চিকিৎসকের অনুপ্রেরণায় আমি এ কোর্স করতে আসি। এখন আমার শরীরে কোনো রকম যন্ত্রণা অনুভব করছি না। আমার মন অনেক প্রশান্ত এবং আমি ভালো আছি। মেডিটেশন করে আমি নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারছি।

[নবম শ্রেণি, নিতাইপাল উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। ৪৫৮ ব্যাচ]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি

উম্মে হাবিবা

আমরা পরিবারের তিন জন একসাথে কোর্স করতে এসেছি। এখানে আসার আগে আমার বেশ কিছু সমস্যা ছিল। প্রায়ই আমি প্রচণ্ড রেগে যেতাম। আমি ভাবতাম, পরিবারের কেউ আমাকে ভালবাসে না। আমার স্বামী প্রতিদিন সকালে হাঁটতে যাওয়ার সময় আমাকে বলত, চলো, হাঁটতে যাই। কিন্তু আমার মনে হতো আমার পায়ে ব্যথা, আমি কোনোদিন সুস্থ হবো না।



কোয়ান্টামে এসে আমি বুঝতে পেরেছি যে, সমস্যাগুলো আমার নিজের তৈরি। মেডিটেশন করে আমার অনেক পরিবর্তন এসেছে। এখন রাগ এলে আর চিৎকার করছি না। কোয়ান্টা ভঙ্গি করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছি। এ-ছাড়া আমি অনেক কোমল পানীয় পান করতাম। গুরুজীর আলোচনা শুনে আমি এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন হয়েছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমি আর কোমল পানীয় পান করব না।

[সহকারী শিক্ষক, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ঢাকা। ৪৫৭ ব্যাচ]

ফেসবুক ডিলিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি

আবু সুফিয়ান রাসেল



আমার ডান পায়ে ও কোমরে অনেক ব্যথা ছিল। সাত বছর ব্যথার জন্যে বিভিন্ন ওষুধ খেয়েছি, যার ফলে ওষুধ কোম্পানির রিফ্রিজেন্টেটভের সাথে একপর্যায়ে আমার পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি নিয়মিত

আমার বাসায় এসে ওষুধ দিয়ে যেতেন।

আমি বিস্মিত যে, কোর্সের প্রথমদিন মেডিটেশন করার পর থেকে আর কোনো ব্যথা অনুভব করি নি এবং আমাকে ওষুধও খেতে হয় নি।

আমি বন্ধুদের প্রায়ই বলতাম, ৪৮ ঘণ্টায় দিন হলে আমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারতাম। আমার সময়গুলো কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, আমি খুঁজে পেতাম না। কোর্সের দ্বিতীয় দিন বুঝতে পারলাম, আমার সময়গুলো নিয়ে নিচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এই ফেসবুক আমার জীবনটাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ডজনের বেশি একাউন্ট আছে আমার। এগুলোতে দিনে ৮-১২ ঘণ্টা সময় আমি কাটাতাম।

কোর্সের তৃতীয় দিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম-ডিলিট ফেসবুক। আমার স্মার্টফোনে এখন ফেসবুক অ্যাপটা আর নেই। গত তিন দিন আমি এসবের কিছুই ব্যবহার করি নি। এখন আমার স্বপ্ন একটাই-আমি একজন ভালো মানুষ হবো।

[শিক্ষার্থী, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। ৪৫৮ ব্যাচ]

সফল হতে হলে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করতে হবে

অধ্যাপক ড. সমীর কে. সাহা

কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে ব্যক্তিজীবন, পরিবার, ধর্ম, সাফল্যের অন্তরায় সোশ্যাল মিডিয়া, সুস্বাস্থ্য-এ সবগুলো বিষয় সুন্দর ও সহজভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এটাকে আমার পরিপূর্ণ একটি কোর্স মনে হয়েছে।



ব্যক্তিজীবনে আমি ফেসবুক, টুইটার-জাতীয় কিছুই ব্যবহার করি না। কিন্তু যোগাযোগ এবং গবেষণার জন্যে আমাকে স্মার্টফোন ব্যবহার করতে হয়। যে-কোনো জায়গায় আমার কাজগুলো করতে পারছি কিনা, এ বিষয়টি আমি নিশ্চিত হতে চাইতাম। তাই স্মার্টফোন ছাড়া জীবন প্রায় অচল মনে হতো।

এক যুগেরও বেশি সময় পর এ চার দিন আমি স্মার্টফোন পুরোপুরি বন্ধ রেখেছি। আমার মধ্যে কোনো অস্থিরতা কাজ করে নি; বরং স্মার্টফোন ছাড়া আমার সময় খুব ভালো কেটেছে। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স থেকে আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া এটাই।

আরেকটি উপলব্ধি হলো, বর্তমানে আমাদের পণ্যসম্পদ করতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আমরা সে ফাঁদে পড়ে যাচ্ছি। যদি আমরা সচেতন হই এবং মানুষে মানুষে সম্পর্ক ও যোগাযোগ ভালো হয়, তবে আমরা এ পণ্যসম্পদ থেকে অনায়াসে বের হয়ে আসতে পারব।

কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের শিশুদের প্যারেডের ভিডিও দেখে আমার মনে হয়েছে, বাংলাদেশ আরো একধাপ এগিয়ে গেছে। জীবনে সফল হতে হলে মেডিটেশন নিয়ে ভাবতে হবে, নিয়মিত চর্চা করতে হবে। তবেই একজন মানুষ উপকৃত হবেন। আমাদের জনশক্তির ৬০% হচ্ছে তরুণ। এই তরুণদের যদি কোয়ান্টামের আলোয় নিয়ে আসা যায় তবে দেশের উন্নতি বেগবান হবে।

[বিভাগীয় প্রধান, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ঢাকা শিশু হাসপাতাল। ৪৫৮ ব্যাচ]

মাইগ্রেনের ব্যথা দূর হয়েছে

যুথি আহমেদ

প্রচণ্ড মাইগ্রেন নিয়ে আমি কোর্স করতে আসি। কিন্তু কোর্সের আলোচনা শুনে ও মেডিটেশন করে এ চার দিন আমি কোনো মাথাব্যথা অনুভব করি নি। কোনো ওষুধও খেতে হয় নি।



এ-ছাড়া আমি রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। রাগের জন্যে পরিবার-পরিজন আমার সাথে কথা বলতে ভয় পেত। কিন্তু এখন যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে শান্ত রাখতে পারছি।

[চাকরিজীবী। ৪৫৮ ব্যাচ]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন



উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : আমি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমার একমাত্র সন্তানও কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। আমাদের টাকা-পয়সা বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই। এজন্যে আমার সন্তান যে পরিমাণ মানসিক অত্যাচার ও অপমানসূচক কথাবার্তা আমাকে বলে, তা আর সহ্য করতে পারছি না। অথচ ওকে সর্বস্ব দিয়ে আমি লেখাপড়া করিয়েছি। নিজের বদ-স্বভাবের জন্যে বিদেশে সিটিজেনশিপ ও ভালো চাকরি ছেড়ে আজ একবছর হলো সে বাংলাদেশে আছে। ক্রেডিট কার্ডের ঋণের চাপ সহ্য করতে না পেরে সে চলে এসেছে। দেশে এসে যদিও পড়াশোনা করছে, চাকরির চেষ্টা করছে কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না। এই অসহায় মা আপনার কাছে দোয়াপ্রার্থী।

উত্তর : এই যে সর্বস্ব দিয়ে লেখাপড়া করিয়েছেন, কেন করিয়েছেন? মানুষ করার জন্যে? বিদেশেই বা কেন পাঠিয়েছেন? অধিকাংশ তরুণ কী করছে বিদেশে গিয়ে? বিদেশে কোনোরকম একটা কিছু করতে পারলে ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায় এবং ওখানে ক্রেডিট কার্ডের কোম্পানির কোনো শেষ নেই। ছেলেকে নিয়ে এখন চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। যখন সে ছোট ছিল, তাকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগটা নেয়া উচিত ছিল সে-সময়।

আমাদের দেশে এই কিছুদিন আগেও মনে করা হতো যে, ছেলেকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারাটা হচ্ছে মা-বাবার জন্যে সবচেয়ে বড় সার্থকতা। সামর্থ্য থাকুক আর না থাকুক, সন্তানকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে হবে। এর পরিণতি কী হলো? আপনার হয়তো আর্থিক সামর্থ্য নেই, কিন্তু আপনার ছেলে তো মিশছে বিত্তবানদের সাথে, নতুন পয়সা হয়েছে এমন পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ছেলেমেয়েরা ‘মানুষ’ হতে পারে না। কিছু ব্যতিক্রম আছে, কিন্তু শতকরা ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে এরা মানুষ হয় না। তারা বাংলায় হয়ে গেছে; না বাঙালি না ইংলিশ। তারা ধনাত্মক পরিবারের ছেলেমেয়েদের বদ-অভ্যাস আয়ত্ত করেছে, অপব্যয় করতে অভ্যস্ত হয়েছে কিন্তু আদব-কায়দা ও দেশীয় সংস্কৃতিকে আয়ত্ত করতে পারে নি। ফলে মা-বাবাকে সম্মান-শ্রদ্ধাও সে করতে শেখে নি।

শিশুকে অবশ্যই তার দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানাতে হবে। ধর্ম সম্পর্কে তাকে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। সন্তানকে জীবনের লক্ষ্য দিতে হবে। সেজন্যে সন্তানকে সময় দিতে হবে। শুধু ক্লাসের শিক্ষা নয়, ভালো মানুষ হওয়ার শিক্ষা দিতে হবে। নইলে সে প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না।

অভিজ্ঞতায় দেখেছি-ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে বা ও-লেভেল এ-লেভেল করে যারা বিদেশে চলে গেছে, তাদের অধিকাংশেরই লেখাপড়া হয় নি। খুব নির্মম শোনালেও এটা সত্য। অতএব মা-বাবাদের বলব, ও-লেভেল এ-লেভেল সম্পন্ন হলেই সন্তানকে বিদেশে পাঠাবেন না। একদম নিশ্চিত হয়ে পাঠাবেন যে, সে উচ্চতর ডিগ্রির জন্যে অর্থাৎ পিএইচডি বা পোস্ট ডক্টরাল পড়াশোনার জন্যে যাচ্ছে।

আর বিদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়া উচিত ফুল স্কলারশিপ হলে। পার্শিয়াল বা আংশিক স্কলারশিপে

বিদেশে গেলে আপনার সন্তান কখনো পড়ালেখা সম্পন্ন করতে পারবে না। এই ফাঁদগুলো সম্পর্কে সচেতন হবেন।

আমেরিকাতে এবং ইউরোপে ঋণের একটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে শিক্ষা। যারা শিক্ষাঋণ নেয়, তাদের সারাজীবন এই ঋণের সুদ বা কিস্তি দিয়ে যেতে হবে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কমিটির রিপোর্ট বলছে, ব্রিটেনে যারা শিক্ষাঋণ নিয়েছে তাদের ৭৫% সারাজীবনেও এটা শোধ করতে পারবে না। অতএব ফুল স্কলারশিপ ছাড়া বিদেশে পড়তে যাওয়াটা বোকামি।

আপনি ছেলেকে বিদেশে পাঠিয়েছেন, সর্বস্ব দিয়ে কিছু ডিগ্রি অর্জন করিয়েছেন কিন্তু প্রকৃত শিক্ষায় সে শিক্ষিত হয় নি। ফলে সে মানুষ হয় নি আর সে-রকম আচরণই সে করছে। আমরা আপনার প্রতি সমবোধী। কিন্তু তার জন্যে দোয়া করা ছাড়া কিছু করার নেই। প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে তাকে বোঝান যেন সে শোধরাতে পারে।

প্রশ্ন : বিদেশে গিয়ে কাজ করাটা আপনি পছন্দ করেন না। কিন্তু আমি ইতোমধ্যে কোরিয়াতে কাজ করার জন্যে লটারি জিতেছি। দেশে আমার বাবা, ভাই ও আমি মিলে ব্যবসা করি। সেখানে মাসে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা আয় হয়। কিন্তু তারা আমাকে আয়ের কোনো টাকাই দেয় না। আর আমি নিজের মতো করে দানও করতে পারি না। বর্তমানে আমি যদি কোরিয়া যাই, সেখানে আমার সর্বনিম্ন বেতন দেড় লক্ষ টাকা হবে। বেতনের টাকা দিয়ে আমি নিজের মনমতো দান করতে পারব। এখন আমার জন্যে বিদেশে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে নাকি বোকামি হবে? দয়া করে পরামর্শ দেবেন।

উত্তর : বিদেশে গিয়ে কী করবেন? আমার মনে হয়, ওখানে উপার্জন করা দেড় লক্ষ টাকা আমাদের দেশে উপার্জিত ৪০ হাজার টাকার সমান। আপনি বিদেশে যে টাকা উপার্জন করবেন, তার ট্যাক্স আছে এবং সেখানকার খরচ আছে। আসা-যাওয়ার খরচ আছে, যারা বিদেশে আদম পাঠায়, তাদের সাথে লেনদেন আছে। সব পরিশোধ করার পর আপনার হাতে খুব বেশি অর্থ থাকার কথা নয়। এ ধরনের চাকরিগুলো খুব একটা সন্তোষজনকও হয় না।

তাছাড়া বিদেশে কতদিন আপনি কাজ করবেন? একবছর, দুই বছর বা তিন বছর। তারপর আপনি দেশে এসে কী করবেন? তখন আপনি ঘরেরও না ঘাটেরও না। আর আপনি ব্যবসা ছেড়ে গেলে স্বাভাবিকভাবে আপনার পারিবারিক ব্যবসাতে লোকবলের সংকট সৃষ্টি হবে।

তাই বাবা ও ভাইয়ের সাথে আরো মেহনত করেন। একটা সময় আসবে যখন আপনার ব্যবসা আরো বাড়বে এবং আপনিও তখন অভিজ্ঞ হবেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আপনার আয় বাড়বে এবং ব্যয়ও করতে পারবেন পছন্দমতো।

যারা বিদেশে যাচ্ছেন, তারা আসলে অধিকাংশই চিন্তাভাবনা না করে হুজুগে পড়ে যাচ্ছেন। আগেকার দিনে ক্রীতদাসদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো আর এখন মানুষ নিজেই প্রলুব্ধ হয়ে যায়। আর

পুঁজিপতিদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে এই ধরনের লোকই দরকার। মনে রাখবেন, সে আপনার শ্রমকে কাজে লাগিয়ে যদি ছয় লক্ষ টাকা উপার্জন করতে না পারে, তাহলে আপনাকে দেড় লক্ষ টাকা দেবে না। আপনি ওখানে গিয়ে যে পরিমাণ পরিশ্রম করবেন সেটা যদি নিজের দেশে করেন, আপনার উপার্জন অনেক বেড়ে যাবে।

শুধু ডিশ ওয়াশ করার জন্যে বিদেশে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। যেহেতু আপনি ব্যবসা করছেন, যদি ব্যবসার গোমর অর্থাৎ রহস্যগুলো বোঝেন এবং সততার সাথে কাজ করেন, তাহলে দেড় লক্ষ কেন, দেড় কোটি টাকাও আপনি উপার্জন করতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমার জীবনের মনছবি কোরআনের হাফেজ হয়ে একজন খতিব ও ইসলামি চিন্তাবিদ হবো। আমি আল্লাহর পথে চলতে চাই কিন্তু অনেকে আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। তারা বলেন, কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট হয়ে আমি অন্ধকার জগতে প্রবেশ করেছি। গুরুজী, আমার মনছবি কি ঠিক আছে? আমার বয়স ১৫ বছর।

উত্তর : আপনি যে আলোর জগতে প্রবেশ করেছেন, এটা তো আপনার এই প্রশ্নই প্রমাণ করে। যদি আপনি মনছবির জন্যে লেগে থাকেন, তাহলে অবশ্যই কোরআনের হাফেজ, খতিব এবং ইসলামি চিন্তাবিদ হতে পারবেন।

যেহেতু আপনি একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, জীবনের সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ আপনার রয়েছে। কারণ আপনি মেডিটেশন করতে জানেন। রসুলুল্লাহ (স) জীবনের সত্যকে যে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, সেটা কিন্তু দীর্ঘসময় ধ্যানস্থ হওয়ার পরে। ২৫-২৬ বছর বয়স থেকে তিনি ধ্যানের জগতে প্রবেশ করেন এবং তিনি উপলব্ধির পর্যায়ে, নবুয়তের পর্যায়ে পৌঁছান ৪০ বছর বয়সে।

আপনি যেহেতু ধ্যান করতে অর্থাৎ আত্মনিমগ্ন হতে শিখেছেন, আপনার পক্ষে কোরআনের হাফেজ হওয়া এবং কোরআনকে উপলব্ধি করা আরো সহজ। আর কোয়ান্টামের আধুনিক ও কল্যাণমূলক জীবনদৃষ্টির চর্চা আপনাকে খতিব হতে বা আলোচনা করতে সাহায্য করবে। তেমনি আপনি ইসলামকে, কোরআনকে এবং আল্লাহর রসুলকে বুঝতে পারবেন আরো ভালোভাবে। আমরা দোয়া করি, আপনি যাতে অনেক বড় একজন মানবপ্রেমিক হাফেজ, খতিব ও ইসলামি চিন্তাবিদ হন।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমি জানি, আমার জীবনের একটি মহৎ লক্ষ্য আছে। প্রতিদিন আমি পা পা করে এ লক্ষ্য অর্জনের পথেই অগ্রসর হবো।

শান্তি আর সংহতিই ধ্যান ও শিল্পের গন্তব্য

নাসির আলী মামুন



শান্তিতে নোবেলজয়ী মাদার তেরেসা ঢাকায় এলেন ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে। খোঁজ পেলাম তিনি আছেন তেজগাঁওয়ের একটি চার্চে। আমি যথারীতি ক্যামেরা নিয়ে হাজির। তার ছবি তুলব। ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম বার কয়েক। কোনো লাভ হলো না। অপেক্ষা করছিলাম কখন তিনি বের হবেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর তিনি বের হলেন এবং দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন গাড়িতে ওঠার জন্যে।

আমি দৌড়ে গিয়ে দুহাত মেলে দাঁড়িয়ে পড়লাম মাইক্রোবাসের খোলা গেটের সামনে। গলায় ক্যামেরা ঝুলছে। ‘এক্সকিউজ মি মাদার! আপনি কি আমাকে একটু সময় দেবেন?’

‘পাঁচ মিনিট সময় তোমাকে দেবো।’—কিছুটা ক্ষুরক্ষুরে এটা বলেই তিনি হনহন করে হেঁটে চার্চের ভেতরে ঢুক পড়লেন।

আমিও তার পেছন পেছন চার্চের ভেতরে একটা ঘরে ঢুকলাম। প্রথমেই তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি কি জানো, তুমি কী অপরাধ করলে?’

আমি কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

তিনি বললেন, ‘পুরনো ঢাকায় যে মিশনারিজ অব চ্যারিটি আছে, সেখানে অনেকগুলো শিশু আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওদের সেবা করার সুযোগ ও সময় দুটোই তুমি নিয়ে নিচ্ছ।’

তার কথা বলা, বিরক্ত ভঙ্গিতে জানালার দিকে তাকানো—এসব আমি দ্রুততালে ক্যামেরাবন্দি করলাম। তারপর হাতজোড় করে ক্ষমা চাইলাম তার কাছে।

এরকম কত স্মৃতি যে ছবি তুলতে গিয়ে হয়েছে, তার হিসাব নেই। একবার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাবেক প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের ছবি তুলতে গেলাম। কিন্তু লোকের ভিড়ে আর নিরাপত্তাকর্মীদের বাধায় কিছুতেই তার কাছে যেতে পারছিলাম না। তিনি চেয়ারে বসে ছিলেন। হঠাৎ আমি লজ্জা ভেঙে চিৎকার দিলাম—‘এক্সকিউজ মি! মিস্টার প্রেসিডেন্ট!’ তিনি অবাক হয়ে পাশ ফিরে তাকালেন, আর আমি সাথে সাথে ক্যামেরার শাটারে চাপ দিলাম।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ আমি বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলি। আমার বয়স তখন ১৮ বছর। এটা আমার সৌভাগ্য। সেদিন রেসকোর্স ময়দানে চারদিক লোকে লোকারণ্য। আমি মাত্র দেড় মিনিটের মতো সময় পেয়েছিলাম মঞ্চের উঠে বঙ্গবন্ধুর ছবি তোলার।

এ পর্যন্ত আমি আট হাজারের বেশি মানুষের মুখছবি ক্যামেরাবন্দি করেছি। আমার কাছে প্রত্যেকটা মানুষের চেহারা হলো একটা স্থাপত্য, একটা নকশা। যার সুনির্দিষ্ট ঠিকানা রয়েছে। একজন আলোকচিত্রী যখন কারো পোর্ট্রেট ছবি তোলেন তখন তার কাছে ব্যক্তির মুখাবয়ব ও নকশাটা যেমন ধরা পড়ে, তেমনি ব্যক্তিটির আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্নাও উঠে আসে সেই ছবিতে।

ছবির প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হয় সেই ছোটবেলায়। পত্রিকায়-ম্যাগাজিনে বা

নাসির আলী মামুন। বিশিষ্ট আলোকচিত্রী ও বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফির পথিকৃৎ। প্রায় পাঁচ দশকের কর্মময় জীবনে ক্যামেরাকে যিনি মনে করেছেন একটি প্রাণময় সত্তা। কবি শামসুর রাহমান তাকে আখ্যায়িত করেছেন ‘ক্যামেরার কবি’ অভিধায়। ১৪ জানুয়ারি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মুক্ত আলোচনায় ‘আলোকচিত্রে শান্তি ও সংহতি’ বিষয়ে তিনি যে আলোচনা করেন, নিম্নোক্ত নিবন্ধটি সেই আলোচনার নির্বাচিত অংশের অনুলিখন।

কাগজের ঠোঙা-যেখানেই ছবি পেতাম, সেটা আমি কেটে রাখতাম। এমনকি বাড়িতে রাখা পত্রিকার ছবিগুলোও রক্ষা পেত না। বন্ধুরা আমার এই ছবিপ্রীতির কথা জানত। তারাও আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করত। যাদের বাসায় রঙিন বই ছিল বা বিভিন্ন ম্যাগাজিন রাখা হতো, তারা জানালার পাশে এগুলো রেখে দিত আমার জন্যে। আর আমি তাদের জ্ঞাতসারে ওগুলো চুরি করতাম এবং সব ছবি কেটে নিতাম। তারপর জায়গামতো রেখে আসতাম। এভাবেই ধীরে ধীরে ক্যামেরা আর ছবি তোলার প্রতি আমার আকর্ষণ তৈরি হতে লাগল।

আমি প্রথম ক্যামেরা হাতে পেলাম ১৯৬৬ সালের জুন মাসে। তখন আমি ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। ক্যামেরাটা ধার নিয়েছিলাম পরিচিত এক স্টুডিও থেকে। সাথে ছিল আমার বড় ভাই। সে আমার ছবি তুলল। আমি তার ছবি তুললাম। সেদিন নিজের তোলা ছবি দেখে মনে হচ্ছিল, অসম্ভব বড় একটি কাজ করে ফেলেছি।

আমাদের তখনো ক্যামেরা কেনার মতো অর্থ ছিল না। মা-বাবার বড় সংসার। সাত ভাই দুই বোন আমরা। পেপার কাটিংয়ের ছবিগুলো দেখে আমি স্বেচ্ছ করতাম। মুখছবির প্রতি আমার আগ্রহ প্রবল হতে শুরু করল। হাতে ক্যামেরা ছিল না ঠিকই। কিন্তু সেই ছোট বয়সেই আমি লক্ষ্য ঠিক করি ফেলি—কী করতে চাই এবং আমি কোথায় যাব।

সে-সময় ফটোগ্রাফি মানেই ছিল ফুল, নদী, পাখি, নিসর্গের ছবি অর্থাৎ মূলত ল্যান্ডস্কেপ ভিত্তিক। কিন্তু আমি চাইলাম মানুষের মুখছবি ও অভিব্যক্তিকে আমার ক্যামেরায় ধারণ করতে, খ্যাতিমান মানুষদের মুখছবির ইতিহাস রচনা করতে। তখন বই-ম্যাগাজিনে আমাদের দেশের লেখক-শিল্পীদের যে ছবি ছাপানো হতো, তার সাথে ব্যক্তির আসল চেহারার কোনো মিল থাকত না। গায়ের রং বদলে যেত, গাল ভাঙা থাকলে দেখাত ফোলা। এরকম পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে আমি প্রথম পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতে শুরু করি। ১৯৭২ সালের কথা সেটা।

দেশের গুণী ও সফল মানুষদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনয়ের সাথে বলতাম—‘আপনি নিশ্চয়ই ছবি তুলতে স্টুডিওতে যান, আপনার সময় ও অর্থ দুটোই ব্যয় হয়। স্টুডিওর হয়ে আমিই না-হয় আপনারদের কাছে আসব। ছবি তুলে দেবো।’ প্রথমদিকে অনেকেই পান্ডা দেন নি। আবার কেউ কেউ প্রস্তাব গ্রহণ করতেন। তারপর ছবি তুলে প্রিন্ট করে তাদের উপহার দিতাম।

এভাবে কেটে গেল কয়েক বছর। এর মাঝে আমি অনেক বিখ্যাত মানুষের ছবি তুলে ফেললাম। ১৯৭৭ সালে বাংলা একাডেমিতে আবেদন করলাম এই ছবিগুলো নিয়ে একটি প্রদর্শনী আয়োজনের জন্যে। ওরা বলল, একাডেমি কোনো গ্যালারি নয় যে এখানে ছবি প্রদর্শন করা হবে। তবে আমার জোরালো যুক্তি ছিল। আমার মতে, কবি-লেখক-সাহিত্যিক এবং শিল্পীরাই হলেন মহাতারকা। ফুল, পাখি, নদীর ছবি যদি প্রদর্শিত হতে পারে, এদের ছবি কেন নয়?

পরবর্তীতে বাংলা একাডেমি থেকে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলো। সে-বছরই ভাষা আন্দোলনের মাসে প্রদর্শনী হলো। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবি শামসুর রাহমান বললেন, ‘বাংলাদেশে বইয়ের মেলা হয়, পোশাকের মেলা হয়, কিন্তু লেখকদের ছবির প্রদর্শনী হয় না। এটা অভিনব। ব্যতিক্রমী।’

৪৭ বছর ধরে আমি ছবি তুলছি। বিখ্যাত ব্যক্তিদের শুধু ছবিই তুলি না, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। সমাজে এদের প্রত্যেকেরই অনেক অবদান রয়েছে। অটোগ্রাফ এবং তাদের আঁকা ছবিও আমি সংগ্রহে রাখি। এসব নিয়ে আমি একটি ফটোগ্রাফি মিউজিয়াম বা ফটোজিয়াম গড়ে তোলার কাজ করছি। নতুন প্রজন্ম যেন জানতে পারে বিখ্যাত মানুষরা দেখতে কেমন ছিলেন, তাদের বেশভূষা ও তাদের অভিব্যক্তি কেমন ছিল। ফটোজিয়াম হবে তাদের জন্যে মুখছবির একটি ইতিহাস। কারণ পৃথিবীতে সবকিছুই দ্রুত বদলে যাচ্ছে।

ফটোগ্রাফি আসলে সংগীত, স্থাপত্য, পেইন্টিং ইত্যাদি বহু কিছুর অর্কেস্ট্রেশন—একটা সিফফির মতো। ক্যামেরায় ক্লিক করলে ছবি উঠবে ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করাটাই আসল কাজ। যিনি তা করতে পারেন তিনিই শিল্পী। আমি সেই চেষ্টাই এখনো করে যাচ্ছি।

আর একজন শিল্পীকে সমাজ, দেশ ও সারা পৃথিবী নিয়েও ভাবতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে যদি হৃদয়তা না থাকে, পরিবেশ যদি সুস্থ না হয়, তবে শিল্পচর্চাও অসম্ভব। এজন্যে আমাদের ধ্যানী ও জ্ঞানী হতে হবে। যখন একজন মানুষ নিজের কাজে একাগ্রতা ও মানবিকতার সমন্বয় ঘটায়, তখন সেটা হয়ে ওঠে অনবদ্য শিল্প। ধ্যানচর্চা ও শিল্পচর্চার গন্তব্য তাই একই—শান্তি ও সংহতি।

১৬ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯ বাংলাদেশ দলের ২৫টি পদকের ২১টিই অর্জন করল কোয়ান্টারা

১-৩ জুন সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিত হয় ১৬ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৯। এতে অংশ নেয় বিশ্বের আটটি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, সিঙ্গাপুর ও চাইনিজ তাইপে) জিমন্যাস্টরা। বাংলাদেশ থেকে অংশ নেয়া নয় জন জিমন্যাস্টের ছয় জনই কোয়ান্টাম কসমো স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী কোয়ান্টা।

প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ দল মোট ২৫টি পদক (১৩টি স্বর্ণ, পাঁচটি রৌপ্য ও সাতটি ব্রোঞ্জ) অর্জন করে। ২৫টি পদকের ২১টিই লাভ করে কৃতী কোয়ান্টারা। এর নয়টি স্বর্ণপদক, পাঁচটি রৌপ্যপদক ও সাতটি ব্রোঞ্জপদক।

১০-১১ বছর বয়সীদের গ্রুপে ফ্লোর, অল-অ্যারাউন্ড ও প্যারালাল বার ইভেন্টে এবং ১২-১৪ বছর বয়সীদের গ্রুপে ফ্লোর, প্যারালাল বার, রিং, পমেল হর্স ও অল-অ্যারাউন্ড ইভেন্টে কোয়ান্টারা স্বর্ণপদক অর্জন করে।

উল্লেখ্য, গত বছর ৩০ মে সিঙ্গাপুরে শুরু হওয়া ১৫ তম সিঙ্গাপুর ওপেন জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৮-তে বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেয় কোয়ান্টাম কসমো স্কুলের কোয়ান্টা উহাইমং মার্মা। ১২-১৪ বছর বয়সের ক্যাটাগরিতে ভলিৎ টেবিল ইভেন্টে ব্রোঞ্জপদক পেয়ে ৩য় স্থান অর্জন করে সে।



রমজানে রক্তদাতাদের সমমর্মিতার দৃষ্টান্ত ব্লাড ক্যাম্প ও ল্যাব থেকে সংগ্রহ ৩,৯৮৯ ইউনিট রক্ত



কোয়ান্টাম ল্যাবে রক্তদান করছেন রক্তদাতারা

প্রতি বছরের মতো এবারও রমজান মাসজুড়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সেন্টার-শাখা-সেল ও ঢাকার বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্লাড ক্যাম্পের আয়োজন করে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। রমজানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদানে শরিক হন মোট ৩,৯৮৯ জন রক্তদাতা। তাদের মধ্যে ব্লাড ক্যাম্প ও মোবাইল ক্যাম্পে রক্তদান করেন ৭৬১ জন এবং ল্যাবে এসে রক্তদান করেন ৩,২২৮ জন।

এবছর রমজানে ব্লাড ক্যাম্পের পাশাপাশি কোয়ান্টাম ল্যাবেও সংগ্রহের পরিমাণ ছিল গত বছরের তুলনায় বেশি।

আপনার এলাকায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বা কর্মক্ষেত্রে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে আগ্রহী হলে যোগাযোগ করুন :

স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন

৩১/ভি, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক,
শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

ফোন : ০১৭১৪-০৪৭৬৩৬

blood.quantummethod.org.bd



আপনার জীবন গড়ার জন্যে
প্রয়োজনীয় কিছু ছোট ছোট ইটের
সাজানো রূপ

আত্মনির্মাণ

১৯৯৮ সালে প্রকাশের পর থেকেই
দুদশকেরও বেশি সময়ে
পৌছে গেছে লক্ষ পাঠকের হাতে।

পড়ুন

সমৃদ্ধ হোন

এগিয়ে যান আলোকিত জীবনের পথে